কানে ভোঁ-ভোঁ শব্দ হয় কেন, কী করবেন

কানের ভেতর নানা কারণে শব্দ হতে পারে। অনেক সময় গোসলের সময় পানি গিয়েও ভোঁ ভোঁ শব্দ হতে পারে। কী কারণে কানে কম শুনছেন এর চিকিৎসা করতে হবে। অনেক সময় কানের শ্রবণশক্তি ঠিক থাকলেও কানের ভেতর শব্দ হয়।

কানে কেন শব্দ হয় এবং এর চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন নাক কান ও গলারোগ বিশেষজ্ঞ এবং সার্জন অধ্যাপক ডা. জাহির আল-আমিন।

যারা কানে কম শুনেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এ শব্দটা হয়। কেউ যদি কানে কম শুনে তবে দেখতে হবে কেন কম শুনেন। কারণ দূর করার পরও যদি রোগী ঠিকমতো না শোনেন তবে একটা মেশিন হেয়ারিং এইডের প্রয়োজন হতে পারে। তার আগে

* কানের ভোঁ-ভোঁ শব্দের দিকে বেশি নজর দেবেন না। মনে রাখবেন আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে সিগন্যাল মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্ক এ তথ্য পর্যালোচনা করে এবং যদি মনে করে এটি প্রয়োজনীয় কেবল তখনই এর দিকে নজর দেয়। আপনি যদি সব সময় কান খাড়া করে বাইরের বিভিন্ন শব্দ শোনার চেষ্টা করতে থাকেন তবে এটা থেকে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর। এর দিকে নজর দেবেন না দেখবেন শব্দ হয়তো থাকবে কিন্তু এটা আপনাকে বিশেষ কষ্ট দেবে না।

* আশপাশে কোনো গান বা সিডি বা অন্য কিছু ছেড়ে রাখুন, অন্য কোনো শব্দ থাকলে আপনি আপনার কানের শব্দ কম শুনতে পারবেন।

* কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন, দেখবেন আপনার কানে শব্দ কম সমস্যা সৃষ্টি করবে।

* মনে রাখবেন, ডাক্তার আপনার সমস্যা বের করার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা করেছে। আপনার কোনো মারাত্মক সমস্যা নেই জেনে নিজেকে উৎফুল্ল রাখুন। কারণ এ শব্দ আপনাকে বেশি কষ্ট দিতে পারবে না।

* অনেক সময় চিকিৎসকরা এর জন্য কিছু ওষুধ দেন বা কানের টিনিটাস মাস্কার নামে এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

* মনে রাখবেন আপনার মনকে বোঝানোর দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আপনার।

অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভর বা ওষুধনির্ভর না হয়ে যদি পারেন তো নিজের মনের রাশ টেনে ধরুন। এতে আপনি অনেক বেশি উপকৃত হবেন। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি আপনার কান, স্নায়ু বা মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা না থাকে তবে আপনিই হবেন আপনার রোগের ডাক্তার।

কানের সমস্যা থেকে মাথা ঘুরানো

আমাদের অন্তঃকর্ণের ভেসটিবুল ও সেমি সার্কুলার ক্যানাল, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করার প্রধান অঙ্গ। বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের অনেক সমস্যা থেকে কানের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার পদ্ধতিতে সমস্যা হতে পারে, যার ফলে মাথা ঘুরাতে পারে।

কানের থেকে মাথা ঘুরানো

* কানের ভেতরে ময়লা জমে গেলে।

* বহিঃকর্ণের ইনফেকশন।

* মধ্য কর্ণের ইনফেকশন যা নাকের পেছন দিয়ে কানের ভেতরে যায়।

* কানের পর্দা না থাকা।

* ঘনঘন কান পাকা।

* কোলেস্টিয়াটমা ও কানের মধ্যে পানি জমে থাকা।

* ঘনঘন অথবা বেশি মাত্রায় সর্দি-কাশি হয়ে ইউস্টিশিয়ান টিউবের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে মাথা ঘুরানো হতে পারে।

* নাকের হাড় বাঁকা থাকা।

* সাইনাসের দীর্ঘদিনের ইনফেকশন সমস্যা থেকেও মাথা ঘুরানো হতে পারে।

এ ছাড়া অন্তঃকর্ণের কিছু সমস্যার জন্য মাথা ঘুরাতে পারে, তার মধ্যে প্রধান হলো অন্তঃকর্ণের ভেতরে ভাইরাল ইনফেকশন। এটা সাধারণত কমন কোল্ড অথবা প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে। এ ছাড়া চিকেন পক্স, মিজেলস থেকেও কানের ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে।

কান ও আশপাশের কিছু জটিল রোগের জন্য মাথা ঘুরাতে পারে যেমন-

* অটোস্কোরোসিস : কানের ভেতর হাড় শক্ত হয়ে যাওয়া।

* মেনিয়ার্স ডিজিজ : অন্তঃকর্ণের প্রেসার বেড়ে গেলে।

* কানের ভেতর টিউমার বা ক্যানসার হলে।

* নাকের পেছনে ক্যানসার হলে।

মাথা ঘুরালে করণীয়

* মাথা ঘুরার সমস্যা বেশি থাকলে একা একা চলাফেরা ঠিক নয়। একিউট অবস্থাতে একা একা চলাফেরা পরিত্যাজ্য, এ অবস্থাতে বিশ্রাম জরুরি এবং অন্যান্য কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

* ঘনঘন বমি হলে শরীরের ভেতরে পুষ্টি, লবণ ও পানির ঘাটতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একিউট অবস্থাতে স্টিমিটিল বা সিনারন জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে। দিনে তিনটা করে খাবেন অথবা প্রয়োজনে স্টিমিটিল ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে। এরপরও সমস্যার উন্নতি না হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

তীব্র গরমেও যেভাবে সুস্থ থাকা যায়

গরমকাল চলছে প্রকৃতিতে। একদিন বৃষ্টি না হলেই ভ্যাপসা গরম। ঘর থেকে বের হলেই ঘেমে অস্থির। ঘরে সিলিং ফ্যানের বাতাসও যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

গরমে সুস্থ থাকার উপায় নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বারডেমের ল্যাবরেটরি সার্ভিসেসের পরিচালক অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী।

গ্রীষ্মের গরমে ঘরের বাইরে রোদে ব্যায়াম করে শরীর ক্লান্ত তো হয়, ঘেমে নেয়ে উঠেন অনেকে। সাঁতার কাটা, সাইকেল চালান, দৌঁড়ান, হাঁটা যাই হোক না কেন। আর কড়ারোদে বেশ কিছু সময় ব্যায়াম করলে

বিপদ হতে পারে যখন-তখন।

ব্যায়ামের আগে শরীর যেন জলপূর্ণ থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন।

শ্বাস ছাড়ছেন, ঘামছেন, প্রস্রাব করছেন, জল তো বেরুচ্ছেই শরীর থেকে। জলের অভাবে শরীরে হবে পানিশূন্য। প্রতিদিন তাই জল পরিপূর্ণ চাই, শরীরের কাজকর্ম যাতে ঠিকমতো চলে সেজন্য যথেষ্ট পানি পান করা চাই, জলীয় খাবার খাওয়া চাই।

কী পরিমাণ পানি চাই শরীরে

প্রতিদিন ১৬ কাপ পানি পুরুষের জন্য আর নারীদের জন্য ১১ কাপ, পরামর্শ ‘ইন্সটিটিউট অব মেডিসিন, ন্যাশনাল একাডেমি, আমেরিকা।

আমাদের প্রতিদিন খাদ্যে জলীয় অংশ থাকলেও বেশির ভাগ তরল আসা উচিত পানীয় জল থেকে। শরীরের যা ওজন, এর অর্ধেক পরিমাণ, আউন্স পরিমাপে যা হয়, তা পানকরা উচিত, যেমন ওজন ১৬০ পাউন্ড হলে অন্তত ৮০ আউন্স পানি পান করা উচিত (আট আউন্স) গ্লাসের দশগ্লাস পানি। গড়পরতা হিসেবে মানুষ নিজের তরল চাহিদা প্রতিদিন মেটায় না।

যদি প্রস্রাবের রং পরিষ্কার বা খড়ের রং হয় তাহলে বুঝবেন যথেষ্ট পানি পান করা হচ্ছে। প্রস্রাব গাঢ় রঙের হলে বুঝবেন পানিশূন্যতা হয়েছে। পিপাসা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক না।

পানি শূন্যতার অন্যান্য লক্ষণ হল বমিভাব, মাথা হালকা লাগা। দিনভর ঠিকমতো পানি পান করছেন তা নিশ্চিত করার জন্য যেখানেই যাবেন, সঙ্গে যেন থাকে পানিভর্তি বোতল।

গাড়িতে রাখুন, কর্মস্থলেও রাখুন। সঙ্গে বহনও করুন, হাঁটলেও। একসঙ্গে সব পানি পান করবেন এজন্য অপেক্ষার দরকার নেই। পানি পান করে পেট ভরাট একসঙ্গে করার দরকার কি, পেট ভারি ভারি লাগবে।

পানি ছাড়া অন্যান্য পানীয় সম্বন্ধে কথা

ব্যায়ামের সময় যে পানি হানি হয়, শুধু পানি পান করেই তা পূরণ করা সম্ভব। তবে যারা ৬০ মিনিটের বেশি, বিশেষ করে গরমকালে ব্যায়াম করেন, তাদের জন্য হাইড্রেশন ড্রিংক (যাতে থাকে পানি, সোডিয়াম-পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট) (যা ঘামের সঙ্গে ক্ষয় হয়) গ্রহণ যথাযথ।

কিছু কিছু এথলেট ব্যায়ামে বা শরীরচর্চায় যে শক্তি ক্ষয় হয়

পরিপূরণের জন্য ও পেশিতে তা পুনঃস্থাপনের জন্য জুস বা দুধ পান করে থাকেন। শরীরে পানিশূন্যতা হলে পায়ে খিচুনি হতে পারে, খিল ধরতে পারে, ক্লান্তি অবসাদ হতে পারে। পর্যাপ্ত পানির অভাবে, শরীর ঘেমে শীতল হতে পারে না। এর ফলে তাপাহত হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়।

গরমে বাইরে যাওয়ার আগে একটু ভাবুন

সকালে যদি ব্যায়াম করতে পারেন (সকাল ১০টার আগে) বা (দিনের শেষে বিকাল ৪টার পর) তাহলে কড়ারোদ এড়ানো যাবে। শীতল ছায়া যেসব পথে আছে সেখান দিয়ে হাঁটুন। মধ্যহ্নে যদি শরীরচর্চা করতে হয় কখনও তাহলে হালকা বর্ষা বেছে নিন, (সাঁতার কাটা বা জল ক্রীড়া) যেদিন খুব বেশি তাপ, সেদিন ব্যায়াম অন্দরে করাই ভালো

অন্দরে শরীরচর্চা

বাইরে উত্তাপ খুব বেশি হলে, তাহলে ঘরের বাইরে বিকল্প অনেক অন্দর-ব্যায়াম আছে। জিমে না যেতে চাইলে, ঘরে বসে সাইক্লিং, জগিং, দড়ি লাফ, ভারউত্তোলন, উঠবস, ডানবৈঠক, ইয়োগা চলতে পারে।

গরমে শিশুর ডায়রিয়া হলে কী করবেন?

গরমে শিশু-কিশোরদের ডায়রিয়ার সমস্যা দেখা দেয়। দিনে তিন বা এর চেয়ে বেশি বার পাতলা পায়খানা হতে শুরু করলে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ ডা. আ ফ ম হেলালউদ্দিন।

পরিপাকতন্ত্রে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণেই ডায়রিয়া হয়ে থাকে। এই সময় ব্যাপক হারে ডায়রিয়ার প্রধান কারণ রোটা ভাইরাস, কখনও কখনও নোরো ভাইরাস। পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে বা প্রবল জ্বর দেখা দিলে তা ভাইরাস নয়, বরং

ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণে হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

ডায়রিয়া পানিবাহিত রোগ। দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে এ রোগ হয়। শহরে ট্যাপের পানি অনেক সময় সেপটিক ট্যাংক বা সুয়ারেজ লাইনের সংস্পর্শে দূষিত হয়। অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, যেখানে-সেখানে ও পানির উৎসের কাছে মলত্যাগ, সঠিক উপায়ে হাত না ধোয়া, অপরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ এবং ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে এ সময় দোকান, রেস্তোরাঁ বা বাসায় ফ্রিজের খাবারে পচন ধরা ইত্যাদি ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ।

ডায়রিয়া হলে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে যায় এবং রক্তে লবণের তারতম্য দেখা দেয়। এই দুটোকে রোধ করাই ডায়রিয়ার মূল চিকিৎসা। প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর অন্তত দুই গ্লাস খাবার স্যালাইন পান করুন। সঠিক পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ও হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে এই স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত, জ্বর, প্রচণ্ড পেটব্যথা বা কামড়ানো, পিচ্ছিল মল, মলত্যাগে ব্যথা ইত্যাদি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করুন। যথেষ্ট প্রস্রাব হচ্ছে কি না, লক্ষ্য করুন। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া বা জিব ও ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া পানিশূন্যতার লক্ষণ। এ সব লক্ষণ দেখা দিলে বা বমির কারণে পর্যাপ্ত স্যালাইন না খেতে পারলে শিরায় স্যালাইন দেয়ার জন্য হাসপাতালে যান।

যেসব লক্ষণে বুঝবেন জরায়ু ক্যান্সার

জরায়ু ক্যান্সার নারীর একটি জটিল রোগ। অনেক সময় উপসর্গ দেখা দিলেও অজ্ঞতার কারণে রোগী বোঝেন না যে তার ক্যান্সার হয়েছে। অথচ সতর্ক হলে এবং সঠিক চিকিৎসা নিলে জরায়ু ক্যান্সার থেকে বেঁচে থাকা যায়।

জরায়ু ক্যান্সারের লক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সেন্ট্রাল

হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বেদৌরা শারমিন।

প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার নারী জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এ ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীরা অসুখ হওয়ার প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করানোর ফলে তাদের বেঁচে থাকার হার ৫০ শতাংশ কমে যায়। যারা প্রথম থেকেই চিকিৎসা করান তাদের বেঁচে থাকার সম্ভবনা থাকে ৯৫ শতাংশ।

অনেকেই মনে করেন যে এই অসুখটি হয়তো প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে হয়ে থাকে কিন্তু এটি ভুল ধারণা। যে কোনো বয়সেই নারীদের জরায়ু ক্যান্সার হতে পারে। বিশেষ করে ৫০ বছর বয়স্ক কিংবা এর থেকেও বেশি বয়সের নারীরা জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিল্পোন্নত দেশের নারীরা বেশি জরায়ু ক্যান্সারে অধিক আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং অন্যদিকে আফ্রিকান, আমেরিকান ও এশিয়া প্রদেশের নারীদের এই ক্ষেত্রে জরায়ু ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম।

জরায়ু ক্যান্সারকে ‘সাইলেন্ট কিলার’ বলা হয়ে থাকে। কারণ এ অসুখ দেখা দিলে অনেক নারীই এর কিছু কিছু লক্ষণ বুঝতে পারেন না। কিংবা ভিন্ন লক্ষণ দেখা দিলেও গুরুত্ব দেন না। তাই সুস্থ থাকতে এ অসুখের পূর্ববর্তী কিছু লক্ষণ সম্পর্কে জেনে রাখুন।

জরায়ু ক্যান্সারের পূর্ববর্তী কিছু লক্ষণ

* নিম্নাঙ্গের চারপাশে চাপ লাগা কিংবা ঘনঘন মূত্রত্যাগ করা

* গ্যাস, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য। হালকা খাবারের পর পেট ভর্তি লাগা, পেটে অস্বস্তি লাগা, ইত্যাদি। পেটের কোনো সমস্যা খুব বেশি হলে তা জরায়ু ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

* অন্য সময়ের থেকে পেটে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়া।

* পেটে অতিরিক্ত ব্যথা কিংবা পেট ফুলে থাকা।

* বমি বমি ভাব কিংবা বারবার বমি হওয়া।

* ক্ষুধা কমে যাওয়া।

* অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা ওজন অনেক বেশি কমে যাওয়া।

* যৌনমিলনের সময় ব্যথা পাওয়া।

* [redacted]

* [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

রং কালো হয়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে আক্রান্ত অংশে ঘা হয়, যা সহজে শুকাতে চায় না বা শুকালেও আবার দেখা দেয়।

ভ্যারিকোস ভেইনের সম্ভাব্য জটিলতা

ভ্যারিকোস ভেইন থেকে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অপেক্ষাকৃত কম। ক্ষেত্রবিশেষে নিচের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে-

* আক্রান্ত শিরাগুলো থেকে বারবার রক্তক্ষরণ হতে পারে।

* সময়মতো চিকিৎসা না করালে ভ্যারিকোস ভেইন থেকে সৃষ্ট চুলকানি ও ত্বকের নিচে জমা হতে থাকা রক্তের লৌহজাত উপাদান থেকে ত্বকের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।

* আক্রান্ত শিরাগুলোর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে কখনও কখনও হঠাৎ তীব্র ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে।

* শিরার ভেতরে জমাট বাঁধা এ রক্ত ছুটে গিয়ে ফুসফুসে আটকাতে পারে, যার কারণে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে যদিও এ আশংকা খুব কম।

* ভ্যারিকোস ভেইন থেকে সৃষ্ট ঘা ক্ষেত্রবিশেষে ক্যান্সারেও রূপ নিতে পারে।

ভ্যারিকোস ভেইন কেন হয়

পায়ের শিরার কথা যদি ভাবি, তাহলে দেখা যায়, স্বাভাবিক নিয়মে এ শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত নিচ থেকে ওপরের দিকে অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে প্রবাহিত হয়। শিরার ভেতরে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ’ভাল্ব’ বা ’কপাটিকা’ থাকে। রক্ত যেহেতু তরল, এর স্বাভাবিক প্রবণতা হল নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়া। পায়ের মাংসপেশির সংকোচন বা মাসল পাম্প (Muscle Pump) ও শিরার ভাল্বগুলো শিরার ভেতর দিয়ে প্রবাহমান তরল রক্তের এ সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবাহকে প্রতিহত করে ও এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহকে নিশ্চিত করে। ভ্যারিকোস ভেইনে আক্রান্ত শিরার পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাল্বের (কুচকির কাছে সেফানো-ফেমোরাল জাংশান অথবা হাঁটুর পেছনে সেফানো-পপলিটিয়াল জাংশান) কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে রক্তের স্বাভাবিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ বিঘ্নিত হয় ও রক্ত নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে। ফলে শিরার ভেতরে রক্তের চাপ বেড়ে যেতে থাকে। দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলতে থাকলে শিরাগুলো ফুলে গিয়ে ভ্যারিকোস ভেইনের সৃষ্টি করে। কেন শিরার এ ভাল্ব বা কপাটিকার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, তা

সঠিকভাবে জানা না গেলেও নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলোর ভূমিকা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

* শিরার দেয়ালের গঠনে জন্মগত দুর্বলতা।

* বেশি ওজন ও বেশি বয়স।

* সন্তান ধারণ।

* দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকা।

এর সব ভ্যারিকোস ভেইনের কারণ না হলেও এরা সমস্যাকে প্রকট করে তুলতে পারে।

চিকিৎসা

প্রাথমিক পর্যায়ে অপারেশন ছাড়াই ভ্যারিকোস ভেইনের চিকিৎসা বা কমপক্ষে এর লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এ পর্যায়ে করণীয় হচ্ছে-

* পা উঁচুতে রাখা

* একটানা দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে বা বসে না থাকা

* বিশেষ ধরনের মোজা ও বিশেষ কিছু ওষুধ ব্যবহার করা।

একটা পর্যায়ে ভ্যারিকোস ভেইনের চিকিৎসায় অপারেশন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মূলত দুই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে-

সনাতন পদ্ধতির অপারেশন : এ অপারেশনে কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে আক্রান্ত ফুলে যাওয়া শিরাগুলো তুলে ফেলা হয় ও রোগের কারণও নির্মূল করা হয়। রোগের বিস্তার খুব বেশি হলে সব জায়গায় কাটাছেঁড়া না করে কোনো কোনো জায়গায় ফুলে যাওয়া শিরার ভেতরে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে এগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এ চিকিৎসা পদ্ধতি স্কেলেরোথেরাপি (Sclerotherapy) নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে এসব শিরা ধীরে ধীরে চুপসে যায়।

লেজার (Endovenous Laser Ablation) ও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন (Radio-Frequency Ablation): এটাই ভ্যারিকোস ভেইন চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কাটাছেঁড়া না করেই রোগের কারণ নির্মূলে লেজার বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে

সকালের ৫ অভ্যাসে আছে ওজন কমানোর মন্ত্র

স্থলতার সমস্যা নাগরিক জীবনে ক্রমশ বাড়ছে। তাই সবাই চান ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বা অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতে। জিমে যাওয়া, মেপে খাওয়াদাওয়া করা, হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো—এত এত চেষ্টার পরেও অনেক সময় ওজন কমতে চায় না। কিংবা কমলেও তা অনেকটা না কমার মতোই। ওজন কমানোর এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তখন অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। পুষ্টিবিদরা বলছেন, এত পরিশ্রম না করে সকালের কয়েকটি কাজের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ওজন কমানোর মন্ত্র।

ভোরে আলোতে নিজেকে দেখুন: সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার উপকারিতা নিয়ে বলা বাহুল্য। এক জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ৮ ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। তার বেশি ঘুমালে হজমের গন্ডগোল দেখা দিতে পারে। দেরি করে ওঠার ফলে নির্দিষ্ট সময় ধরে শরীরচর্চা করা যায় না। ভেবেচিন্তে স্বাস্থ্যকর নাস্তা বানিয়ে খাওয়ার সময়ও থাকে না। ভোরে বিছানা ছাড়লে সময় নিয়ে ব্যায়াম, নাস্তা—সবই নিয়মমাফিককারা সম্ভব হয়।

এক গ্লাস হালকা গরম পানি খেয়ে সকাল শুরু করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়
মেডিটেশন: মেন্টাল স্ট্রেস থেকে মুক্তি পেতে মেডিটেশনের কোনো বিকল্প নেই। সারা দিনের জন্য নিজেকে চনমনে রাখতে মেডিটেশন বা ধ্যান করতে পারেন। ৫-১০ মিনিট ধ্যান করে নিলে মন এবং মাথা শান্ত থাবে। শরীরের ভেতর থেকে শক্তি পাওয়া যাবে। প্রতিদিন ধ্যান করার অভ্যাসে ওজনও থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

এক গ্লাস হালকা গরম পানি: এক গ্লাস হালকা গরম পানি খেয়ে সকাল শুরু করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে ওজন কমাতে চাইলে গরম পানি বেশ কার্যকর। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বের করে দিতে গরম পানির জুড়ি মেলা ভার।হজমের উন্নতিতেও দারুণ সাহায্য করে গরম পানি।



প্রোটিন আছে এমন খাবার অনেকক্ষণ পেট ভরতি রাখতে সাহায্য করে খাবের থাকুক প্রোটিন: ওজন কমানোর সময়ে অনেকেই প্রোটিন ঠিক মতো খান না। পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রোটিন আছে এমন খাবার অনেকক্ষণ পেট ভরতি রাখতে সাহায্য করে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। অনেকক্ষণ ধরে শরীরচর্চা করার শক্তিও জোগায় উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার।

শরীরচর্চা: ওজন কমানোর অন্যতম অস্ত্র। ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা করতেই হবে। এর বিকল্প কিছু নেই। জিমে হোক বা বাড়িতে, শারীরিক পরিশ্রম বজায় রাখতে হবে। সকালের দিকে শরীরচর্চা করে নিলে তা ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় বেশি প্রভাব ফেলে।

যেসব খাবারে অবসাদ দূর হয়

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অফিসের যেকোনো কারণে আপনার মধ্যে অবসাদ ভর করতে পারে। অনেক সময় কাজের চাপেও এমনটি হয়। দীর্ঘমেয়াদে এই ডিপ্রেশন বিষিয়ে দেয় জীবন।

খাদ্যাভ্যাস ও জীবন পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনলে অবসাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার আলো সেসব খাবার সম্পর্কে জানিয়েছেন।

ম্যাগনেশিয়াম: অবসাদের লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হলো হালকা অমনোযোগিতা ও আত্মহনণের ইচ্ছা। এটা ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে হতে পারে। ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবারে মন ভালো থাকে ও উন্নত হয়। এ জন্য খেতে হবে মিষ্টিকুমড়া, সূর্যমুখীর বিচি, তিসির বীজ, আলমন্ড, কাজুবাদাম, বিনস, ডাল, মাসকলাই, সয়াবিন, গাঢ় সবুজ শাক যেমন পালংশাক এবং গোটা শস্য।

ভিটামিন সি : এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট। যা সাধারণ ঠান্ডা উপশম করে। এ ছাড়া হৃদরোগ, ক্যানসার, স্ট্রোক, চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করে মনকে ঠিক রাখে। এগুলো হলো

নিউরোট্রান্সমিটার ও নরইপিনেফ্রিন। প্রতিদিনের খাবারে ভিটামিন সি যেমন-স্ট্রবেরি, বেলপেপার, তরমুজ, আনারস, জাম, টমেটো, গাঢ় সবুজ শাকসবজি অথবা ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।

মেডিটেরিয়ান ডায়েট: এক গবেষণায় দেখা গেছে মেডিটেরিয়ান ডায়েট অবসাদ বা ডিপ্রেশন কমাতে সাহায্য করে। মেডিটেরিয়ান ডায়েটে প্রাধান্য পায় মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন বি।

ভিটামিন বি: বি এবং ফলিক অ্যাসিড ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি দেয়। আমাদের মুডকে নিয়ন্ত্রণ করে ও মস্তিষ্কে সংবাদ পৌঁছে দেয়। সব বি-ভিটামিনই এ কাজ করে থাকে। ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি তৈরি করে। এটা গামা এমাইনো বিউটাইরিক অ্যাসিড-এর ওপর কাজ করে সেরোটোনিন ও ডোপামিন-এ ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি নিু মাত্রায় নিউরোট্রান্সমিটারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে অবসাদ ও অন্যান্য মুডকে বিশৃঙ্খল করে থাকে।

মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অলিভ অয়েল, ক্যানোলা অয়েল, বাদাম, তেল, কাজু বাদাম, সরিষার তেল। পর্যাপ্ত ওমেগা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায় মাছ, বাদাম এবং ডাল থেকে। মাংস ও এলকোহল এ সময় বাদ দেওয়াই ভালো।

এছাড়া শারীরিক ব্যায়ামেও অবসাদ দূর হবে।

ব্যায়াম : প্রতিদিন ৩০-৫০ মিনিট ব্যায়াম ডিপ্রেশন বা অবসাদ কমাতে সাহায্য করে। এটা মন ভালো করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ এবং ক্যানসার প্রতিরোধ করে। যখন আমরা ব্যায়াম করি, আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এটি আমাদের প্রশান্তি দেয়, আমাদের শরীর থেকে রাসায়নিক নিঃসরণ হয় যা আমাদের ভালো অনুভূতি দেয়।

মেডিটেশন: শক্তিশালী মন ও শরীরের সংযোগ আমাদের প্রশান্তি ও সুখভাব অনুভবে সাহায্য করে। মেডিটেশনের জন্য প্রয়োজন নিরিবলি, একলা, আরামদায়ক ভঙ্গি ও সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস। এর মাধ্যমেই নির্দিষ্ট জিনিসের ওপর ছায়া ফেলে মনোযোগী হতে হবে। বাস্তব এবং জাগতিক বিষয় ভুলে একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন ১৫ মিনিট মেডিটেশন করলে অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

যোগব্যায়াম: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সেন্ট্রাল হেলথের মতে ৭৩

শতাংশ লোক যোগব্যায়ামের মাধ্যমে অবসাদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এ ছাড়া মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়ার অনুশীলন করলে ভালো থাকা যায়।

ভালো ঘুমের জন্য যা প্রয়োজন

আমাদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ঘুম অপরিহার্য। পর্যাপ্ত ও আরামদায়ক ঘুম আমাদেরকে সক্রিয় ও সতেজ করে তোলে। সাধারণভাবে স্বাস্থ্যকর ঘুম বলতে প্রতি রাতে একটি নির্দিষ্ট সময় ঘুমকে বুঝানো হয়। একে অনেকে ঘুমের পরিমাণ হিসাবে ধরে নেয়। যদিও ঘুমের পরিমাণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ভালো ঘুমের জন্য এর পরিমাণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো গুণগত মান। নিয়মিত আরামদায়ক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘুম আমাদের সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন রাজধানীর ইনজিনিয়াস পালমো ফিটের স্লিপ কনস্যালট্যান্ট ডা. ফাতেমা ইয়াসমিন

ঘুমের পরিমাণ কী?

ঘুমের পরিমাণ বলতে বোঝায় আপনি প্রতি রাতে কত ঘণ্টা ঘুমান। বয়সভেদে মানুষের ঘুমের সময় তারতম্য হয়।

* বয়স : ঘুমের চাহিদা (২৪ ঘণ্টায়)

* নবজাতক (০-৩ মাস) : ১৪-১৭ ঘণ্টা

* শিশু (৪-১২ মাস) : ১২-১৬ ঘণ্টা

* বাচ্চা (১-২ বছর) : ১১-১৪ ঘণ্টা

* প্রি-স্কুল (৩-৫ বছর) : ১০-১৩ ঘণ্টা

* স্কুল বয়সের শিশু (৬-১২ বছর) : ৯-১২ ঘণ্টা

* কিশোর (১৩-১৮ বছর) : ৮-১০ ঘণ্টা

* প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৬৪ বছর) : প্রতি রাতে ৭-৯ ঘণ্টা

* প্রাপ্তবয়স্ক (৬৫+ বছর) : প্রতি রাতে ৭-৮ ঘণ্টা

এটি একটি সাধারণ নির্দেশিকা করা হয়েছে। এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের তাদের বয়সের জন্য প্রস্তাবিত পরিমাণের চেয়ে বেশি বা কম ঘুমের প্রয়োজন। এমনকি কিছু নিয়মের ব্যতিক্রমগুলো বিবেচনা করেও এমন অনেক লোক রয়েছে যারা নিয়মিত তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘুমায় না। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৫০ থেকে ৭০ মিলিয়ন আমেরিকানরা কোনো না কোনো ধরনের ঘুমের রোগে ভুগছেন এবং প্রায় ৩৫ শতাংশ আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্করা প্রতি রাতে প্রয়োজনীয় সাত ঘণ্টার চেয়ে কম ঘুমায়। অপর্যাপ্ত ঘুমে সড়ক দুর্ঘটনা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এবং জটিল রোগের ঝুঁকিগুলোও দেখা যায়। অপর্যাপ্ত ঘুমের প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কের উপর সরাসরি পড়ে। হার্ভার্ড মেডিকেলের গবেষণায় দেখা গেছে যারা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমান তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে আমাদের শরীরে কর্টিসল নামক একটি হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যায়। যার প্রভাব পড়ে আমাদের উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তের উচ্চ মাত্রার গ্লুকোজের উপর। অপর্যাপ্ত ঘুমের প্রভাবে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং দ্রুত মুড পরিবর্তন হয়।

ঘুমের গুণগত মান কী

ঘুমের গুণমান বলতে বোঝায় আপনি কতটা ভালো ঘুমান।

সঠিক মানের ঘুমের জন্য রয়েছে ৫টি উপকরণ :

* ঘুমিয়ে পড়ার সময়: আপনি কত দ্রুত এবং কত সহজেই ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ বিছানায় যাওয়ার ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে সক্ষম হয়।

* ঘুমের ধারাবাহিকতা বজায়: একবার ঘুমিয়ে পড়লে একটানা আপনার ঘুমিয়ে থাকার ক্ষমতা। ভালো মানের ঘুম হয় ক্রমাগত, রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায় না।

* ঘুমের কার্যকারিতা: ঘুমের কার্যকারিতা মানে আপনি কতটা সময় ঘুমিয়েছেন বনাম আপনি কতটা সময় ঘুমানোর জন্য বিছানায় কাটিয়েছেন। সঠিক মানের ঘুমের জন্য ঘুমের কার্যকারিতা মোট সময়ের অন্তত ৮৫ শতাংশ মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়।

* ঘুমের সময়: ঘুমের সময় বলতে বোঝায় যখন প্রতিদিন একটি

নির্দিষ্ট সময় ঘুমানো। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি নির্দেশ করে প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমানো এবং জেগে ওঠা।

* ঘুমের তৃপ্তি: ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ লাগা ও সারা দিন উদ্যমী থাকা। এভাবে ঘুমের পরিতৃপ্তি পরিমাপ করা হয়।

খারাপ মানের ঘুমের ক্ষতি কী?

খারাপ মানের ঘুমের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর স্বাস্থ্য ঘাটতি দেখা যায়। যেমন-কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, ভুলে যাওয়া প্রবণতা, মনোযোগ কমে যাওয়া, মানসিক চাপ বৃদ্ধি, বিষণ্নতা এবং উদ্বেগ দেখা দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠতে সমস্যা হচ্ছে অথবা খিটখিটে মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে ওঠা, সারা দিন ক্লান্তি ভাব থাকা, দিনের বেলা ঘুমানো, দিনে অনেক বেশি ঘুমানো। এ ছাড়া ওজন বৃদ্ধি এবং স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কলস্টেরল, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক হয়।

রাতের আরামদায়ক ঘুমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর ঘুমের কিছু চিহ্ন আছে। যেমন-

* সকালে ঘুম থেকে উঠেই সতেজ অনুভূতি

* সারা দিন সতেজ থাকা

* ভালো মেজাজে থাকা

* পরিষ্কার-মাথা অনুভব করা

কীভাবে ঘুমের পরিমাণ এবং গুণগত মান উন্নত করা যায়

ভালো ও স্বাস্থ্যকর ঘুম পেতে আপনি যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে-

* ঘুমের সমস্যা নির্ণয় করা: আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ঘুমের সমস্যা আছে যা আপনার ঘুমকে প্রভাবিত করছে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

* জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করুন: যদিও আপনার জীবনের কিছু অংশ অন্যদের তুলনায় পরিবর্তন করা কঠিন হতে পারে, আপনি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন যা সম্ভবত আপনার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এবং আপনার ঘুমকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। যেমন-নিয়মিত ব্যায়াম করা, ধূমপান,

অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন বাদ দিন।

* ঘুমের পরিবেশ নিশ্চিত করুন: বেশিরভাগ লোক তাদের ঘুমের পরিবেশের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করেন। যদিও প্রত্যেকেরই নিজস্ব পছন্দ রয়েছে, মানুষ সাধারণত অন্ধকার, শান্ত, আরামদায়ক পরিবেশে ঘুমাতে পছন্দ করে।

* ফোন ও ট্যাব বন্ধ: গবেষণায় দেখা গেছে শোওয়ার সময় ফোনের ব্যবহার ঘুমের ব্যাঘাত হয়। বিছানায় ফোন এবং অন্যান্য ডিভাইস ব্যবহার করায়, ঘুমের সময়ের গতি হারাতে পারেন এবং আপনার প্রকৃত শোওয়ার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে দেরি হতে পারে।

স্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস কীভাবে প্রয়োগ করবেন তা আপনি নিশ্চিত না হলে, আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

প্রথম সন্তানের হৃদরোগ হলে কি দ্বিতীয়টিরও হয়?

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু ছোটবেলা থেকেই নানান স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। তাদের বিশেষ যত্ন নিতে হয়। অনেকেরই জানা নেই জন্মগত হৃদরোগ হলেও অনেক শিশু জন্মের সময় স্বাভাবিক থাকে। জন্মের ৩ মাস পর শিশুর গুরুতর হৃদরোগ ধরা পড়তে পারে।

প্রথম সন্তানের জন্মগত হৃদরোগ হলে দ্বিতীয় সন্তানের জন্য কখন পরিকল্পনা করা উচিত, আর দ্বিতীয় শিশুরও জন্মগত হৃদরোগ হওয়ার আশঙ্কা কতটুকু এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সভাপতি বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতি এবং সভাপতি পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সোসাইটি অব বাংলাদেশ অধ্যাপক ডা. মনজুর হোসেন।

স্বাভাবিক পদ্ধতিগত শরীরের রক্তচাপ প্রায় ১০০-১২০ mmHg (সিস্টোলিক) এবং ৬০-৮৯ mmHg (ডায়াস্টোলিক)। ফুসফুসের রক্তচাপ সিস্টেমিক চাপের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে গড় SpO2 হলো ৬০-৬৫% এবং বাম দিকে SpO2 হল >৯৫%। সাধারণত, বাম হৃৎপিণ্ডে

রক্ত প্রবেশের একটি মাত্র পথ থাকে, তা হলো পালমোনারি সঞ্চালনের মাধ্যমে।

মায়ের গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ফুসফুস অ্যামনিওটিক তরলের মধ্যে একটি ভাসমান বেলুনের মতো থাকে, তাই বিকল্প চ্যানেলগুলো, অর্থাৎ পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস পাওয়া যায়। এ চ্যানেলগুলো জন্মের পরে এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। যদি বন্ধ না হয়, তাহলে জটিলতা তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে কিছু জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলো খোলা থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে খোলা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা দেওয়া হয়।

জন্মগত হৃদরোগের লক্ষণ

বিভিন্ন উপসর্গ দেখে শিশুর মধ্যে হৃদরোগ শনাক্ত করা যায়। তবে, বয়স অনুসার লক্ষণগুলো পরিবর্তিত হয়। কিছু কিছু উপসর্গ থাকলে শিশুর হৃদরোগ আছে তা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়। জন্মগত হলেও জন্মের পর বা কিছু সময়ের জন্য জন্মগত হৃদরোগের কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। কখনও কখনও সাধারণ জন্মগত হৃদরোগ, যেমন ‘হোল-ইন-হার্ট’ জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে শনাক্ত করা যায় না। সবচেয়ে সাধারণ হৃদরোগ যেমন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস প্রথম ১-৪ সপ্তাহে লক্ষণহীন থাকতে পারে। এটি ফুসফুসের চাপ এবং রক্তপ্রবাহ পরিপক্কতায় বিলম্বের কারণে ঘটে থাকে। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ত্রুটি এবং পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস (ভিএসডি এবং পিডিএ) ধীরে ধীরে ফুসফুসের চাপ ও রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং হার্টের আকারও বাড়ায়।

হৃৎপিণ্ডে একটি বড় ছিদ্র হলে ফুসফুস এবং শরীরের মধ্যে রক্ত প্রবাহের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। হৃৎপিণ্ডে একটি বড় ছিদ্র বর্ধিত শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রচেষ্টার জন্য হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শরীরের বৃদ্ধি ধীর হয়, দুর্বল বা ওজন বৃদ্ধি পায় না। জন্মের ৪-৬ সপ্তাহ পরে লক্ষণগুলো শুরু হয়।

অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট হলো আরেক ধরনের ছিদ্র, যা অনেক বছর ধরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সুপ্ত থাকতে পারে। স্টেনোসিস বা ভালভের সংকীর্ণতা যে কোনো বয়সে এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত।

যারা হৃদরোগের জন্য কিছু সূত্র খুঁজে বের করতে ক্লিনিকাল পরীক্ষা ছাড়াও বিশেষ কিছু পরীক্ষা যেমন বুকের এক্স-রে, ইকো এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফি উপর ভিত্তি করে CHD-এর উপস্থিতি সনাক্ত করতে পারে। নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখা গেলে অবশ্যই জন্মগত হৃদরোগের ব্যপারে শিশু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

* দুধ খাওয়ার সমস্যা: শিশু যদি কিছু সময় দুধ চুষেই হাপিয়ে যায় এবং দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তারপর আবার চুষতে শুরু করে অথবা দুধ খেতে বেশি সময় নেয় (>২০ মিনিট), কিংবা খাওয়ার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায় এবং ঘাম হয়।

* ওজন বৃদ্ধি সন্তোষজনক না হলে: শিশুর ওজন বৃদ্ধির হার বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ না হলে।

* ঘনঘন ঠান্ডা লাগা বা কাশি হওয়া: শিশুর বারবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাহলে আংশকা থাকে তার হার্টের ত্রুটি আছে।

* জ্বর বা কাশি ছাড়া, ক্রমাগত দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস (এমনকি ঘুমের সময়) এবং বুকের পাজর বা খাঁচা দেবে যাওয়া।

* শিশুর হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত চলে (এমনকি ঘুমের সময়ও)। মা-ই এ বিষয়টি সহজে ধরতে পারবেন।

lPrecordial bulge: বুক একপাশে ফুলে যাওয়া। কোন কোন শিশু সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত শ্বাস নিতে শুরু করে।

* নীল শিশু (Cyanotic Heart Disease) : শিশুর ঠোঁট, জিহ্বা এবং নখ নীলাভ হবে বা কান্নার সময় নীল হয়ে যায়। জন্মগত হৃদরোগের কারণে ত্বক, নখ, জিহ্বা এবং ঠোঁটের রঙ পরিবর্তন হতে পারে। এটি ঘটে যখন ভালো বা অক্সিজেন সমৃদ্ধ লাল রক্ত অক্সিজেন ক্ষয়প্রাপ্ত নীল রক্তের সাথে মিশে যায় এবং শরীরে সঞ্চালিত হয় যা ত্বক, নখ, জিহ্বা এবং ঠোঁটে সর্বদা বা কমপক্ষে যখন সে কাঁদে তখন স্পষ্ট হয়। এটি একটি গুরুতর জন্মগত হৃদরোগ, যার জন্য প্রাথমিকভাবে ওপেন হার্ট সার্জারির প্রয়োজন হয়। উপরের কয়েকটি লক্ষণ বা সমস্যা পরিলক্ষিত হলে ডাক্তারের পরামর্শে জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহে হার্ট সার্জারি করাতে হবে।

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুর যত্ন

কিছু কিছু CHD-এর প্রাথমিক বা জরুরী হস্তক্ষেপ ও চিকিৎসা

প্রয়োজন হয়, অন্যথায় শিশুর বেঁচে থাকা ঝুঁকিতে পড়ে বা অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। CHD-এর লক্ষণ ও টাইপের উপর নির্ভর করে কিছু CHD নিয়মিত ফলো-আপের প্রয়োজন হয় এবং প্রথম দিকে প্রতি কয়েক সপ্তাহ পর পর প্রয়োজনীয় ফলো-আপ প্রয়োজন হতে পারে।

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, তবে কিছু কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাই মাতা-পিতাই সঠিক ভাবে যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারেন। যদি সময় মতো CHD নির্ণয় করা হয় এবং চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় তবে বেশিরভাগ CHD নিরাময়যোগ্য। অনেক শিশুর ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি এবং কিছু ক্ষেত্রে দেরিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। তবে, CHD-এর বেশিরভাগই সাধারণ ত্রুটি এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু ওষুধেই নিরাময়যোগ্য।

যেসব শিশু সময়মতো চিকিৎসা পায়, তারা তাদের পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী জীবন ধারন করতে পারে। অন্যদিকে, CHD আক্রান্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না এবং তাদের একটি সীমাবদ্ধ ও পরিমিত জীবনধারা পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাদের একাধিক পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। নীল শিশুরা ডিহাইড্রেশন এবং রক্তস্বল্পতা সহ্য করতে পারে না, তাই এই নীল শিশুরা কান্না করলে তাদের সমস্যা গুরুতর হয়ে যায়, যাকে স্পেল বলা হয়। যখন তারা দ্রুত শ্বাস নেয় ও আরও নীল হয়ে যায় এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এই শিশুদের ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

CHD আক্রান্ত হলে সময়মতো চিকিৎসা সর্বোত্তম ফলাফল নিয়ে আসে। প্রথম সন্তান যদি CHD-তে আক্রান্ত হলে সেই মা যদি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হন তাহলে অনাগত শিশুদের মধ্যে ২-৫% এর CHD-তে আক্রান্ত ঝুঁকি থাকে। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় প্রসূতি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চলা উচিৎ। ১৬ থেকে ১৯ সপ্তাহের মধ্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে গর্ভের শিশুর CHD ধরা পড়লে গর্ভপাতের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেনেটিক কাউন্সেলিংয়েরও সুপারিশ করা হয়।

গরমে সুস্থ থাকতে যেসব পুষ্টিকর খাবার খাবেন

গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীর অনেকটাই ক্লান্ত থাকে। শিশু, কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সি মানুষ অতিরিক্ত গরমে হাঁপিয়ে উঠেন। এ সময় খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে একটু যত্নবান হওয়া লাগে। চর্বি ও তৈলাক্ত খাবার বাদ দিতে হয়। সহজে হজম হয় এমন খাবার খাওয়া উচিত। যথাসম্ভব রিচ ফুড পরিহার করা উচিত।

গরমে সঠিক পুষ্টি বজায় রাখার জন্য এবং রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সঠিক পুষ্টি খুব জরুরি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন হারবাল গবেষক ও চিকিৎসক ডা. আলমগীর মতি।

সহজে হজমযোগ্য খাবার: শিশুরা প্রচুর ছোটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করে। ফলে অতিরিক্ত শারীরিক শ্রমের পর যে কোনো ভারি খাবার শিশুদের হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। এমনকি বমি বমি ভাবের সৃষ্টি করে। তাই অতিরিক্ত তেলের খাবার, ভাজাপোড়া খাবার শিশুদের দেয়া উচিত নয়। গ্রীষ্মে শিশুদের চিপস, বাদাম, পাপড়, চানাচুর, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি না খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়। বরং নরম, সুস্বাদু, ঘরে তৈরি খাবার যা সহজে হজম হয় সেগুলো শিশুকে দিতে হবে। পুডিং, সিদ্ধ নুডলস, নরম ভাত, মাছ, মুরগির মাংস, নরম সুজি, ঘরে তৈরি ফলের জুস ইত্যাদি খাওয়াতে পারলে ভালো।

দুধের বিকল্প খাবার : দুধ শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি খাবার, যা ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের বড় একটি উৎস। কিন্তু গরমের সময় শিশুকে জোর করে দুধ খাওয়ালে অনেক শিশুর ক্ষেত্রেই তা হজমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এতে শিশু অস্বস্তি বোধ করতে পারে। তাই গরমের সময় দুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে জোর না করে ঘরে তৈরি লাচ্ছি, মাঠা, মিল্কশেক ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে।

রুটিন মেনে চলা: গরমের এই সময় সঠিক পুষ্টি ও ক্যালরির চাহিদা বজায় রাখার লক্ষ্যে সঠিক সময় মেনে খেতে হবে। সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে সকালের নাশতা খেতে হবে। দুপুর ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে দুপুরের খাবার খেতে হবে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে রাতের খাবারের রুটিন রাখা ভালো। এরপর মধ্যসকাল, বিকাল ও শোয়ার আগে শিশুকে হালকা খাবার, বিশেষ করে তরল খাবার দিতে হবে।

তাজা খাবার : এ সময় শিশুদের তাজা খাবার খাওয়াতে হবে। কেননা এ সময় ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং অনেক বেড়ে যায়। এ ছাড়া গরমে খাবারে দ্রুত পচন ধরে। তাই শিশুকে সতেজ খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। যেমন, শিশুদের স্কুলের টিফিনে ফল ও সবজির কোনো প্রিপারেশন করা যেতে পারে। কেননা সবজি ও ফল দ্রুত ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে। টিফিন হিসেবে বিস্কুট, ডিম, ডিমের নুডলস ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে।

তাজা মৌসুমি ফল : গরমে তরলের চাহিদা ও ভিটামিন মিনারেলের দৈনিক চাহিদা পূরণে ফল দারুণ সাহায্য করে। এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধ ও সংক্রমণের বিরুদ্ধেও ফল অনেক কার্যকর। তাই এ সময় তরমুজ, বাঙ্গি, আম, লিচু ইত্যাদি ফল শিশুদের জন্য বেশ উপকারী। তবে একেবারে খালি পেটে ফল খাওয়াবেন না।

পর্যাপ্ত তরল দিন : গরমে শিশুদের অনেক ঘাম হয়। ফলে শিশুদের পানি ও ইলেকট্রোলাইটসের ঘাটতি দেখা দেয়। অনেক শিশুকে ডিহাইড্রেশন ও হিটস্ট্রোক নিয়েও হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখা যায়। তাই শিশু পানি ও তরল খাবার কতটুকু খেল, সে বিষয়টি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। স্কুলে পানি কতটুকু দেয়া হল আর কতটুকু পানি শিশু খেল তা-ও লক্ষ্য করুন। স্কুল ছুটির পর ডাবের পানি, লেবুর পানি, কাঁচা আমের জুস ইত্যাদি খেতে দেওয়া ভালো।